প্রথম আলো

তারিখ 03 NOV 2016
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

পরীবাগে সড়কের ওপর পথশিশুদের স্কুল 'হাসিমুখ'-এ পড়াশোনা করছে শিশুরা ● প্রথম আলো

ওরা হাসিমুখে পড়ে

সুহাদা আফরিন ●

ঘড়িতে তখনো চারটা বাজেনি। সড়ক বিভাজকের ওপর একটি দেবদারুগাছে ঠেস দিয়ে কী যেন লিখছে। বিকেলের সূর্যের আলো তার মুখে এসে পড়ছে। কাছে যেতেই মুখ উঁচিয়ে তাকাল। নাম উর্মি আক্তার। শিশু শ্রেণিতে পড়ে। কিন্তু স্কুল? উর্মি হাত দিয়ে সড়ক দেখিয়ে দিল।

কারও হাতে স্কুলব্যাগ, কারও বা কাপড়ের শপিং ব্যাগ। ভিড়তে শুরু করছে ছোটদের দল। উর্মির মতো অনেকেই বাড়ির কাজ অনুশীলন করছে। কেউ কেউ আবার খেলায় মগ্ন। ওদের শিক্ষকেরা এখনো এসে পৌঁছাননি।

কাউকে দেখে বোঝা যাবে না যে জোর করে ওদের পড়তে পাঠানো হয়েছে। সময়ের আগেই ওরা উপস্থিত থাকে। কারণ, স্কুলটার নামই হাসিমুখ। কাঁটাবন থেকে শাহবাগ যেতে আজিজ সুপার মার্কেটের আগে বাঁ দিকে একটি সড়ক হাতিরপুলের দিকে গেছে। সড়কটি ধরে কিছুটা সামনে গেলেই দেখা মিলবে শ খানেক হাসিমুখের।

গতকাল বুধবার বিকেলে গিয়ে ওদের দেখা মেলে। দূর থেকে একজনকে এগিয়ে আসতে দেখেই 'ওই যে মিনারা মিস' বলে তিন-চারজন দিল ছুট। ঘাসফুলের মধ্যে রাধাচূড়া দিয়ে ফুলের তোড়া বানিয়ে ওরা মিনারা মিসকে উপহার দিল।

জোবাইদা ইসলাম, মহিবুল্লাহ শাহীন, বাপ্পিসহ কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া শিক্ষার্থী এ সড়ক দিয়ে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। তখন এখানে ছিন্নমূল মানুষের বসবাস ছিল। সড়কের ওপরেই এখানকার শিশুরা খেলত। ওদের সঙ্গে কথা বলে ওই বন্ধুরা জানতে পারলেন পড়ার আগ্রহের কথা। ২০১০ সালের এপ্রিলে পত্রিকা বিছিয়ে পাঁচ-ছয়জন শিশুকে তাঁরা শিক্ষার হাতেখড়ি দেওয়া শুরু করলেন।

শুরুর দিকের সব সদস্য এখন যুক্ত নেই। তবে জোবাইদা ইসলাম আছেন। নিজে কর্মজীবী। তেমন সময় দিতে পারেন না। মুঠোফোনে তাঁর কাছ থেকেই শুরুর গল্প জানা গেল। জোবাইদা বলেন, 'মজা করে শুরু করলেও পরে আমরা ভাবি, এটাকে চালিয়ে নিতে হবে। দেখে অনেকেই সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকেন। নিজেরাও পয়সা বাঁচিয়ে খরচ চালাতাম।' তিনি আরও বলেন, যাদের প্রাইভেট টিউশন দেওয়ার সামর্থ্য নেই, তারা পড়ে। শিক্ষার্থীরা আশপাশের স্কুলে পড়াশোনা করে। আর বিকেলে এখানে এসে পড়ে। শিশু শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এখানে আসে।

প্রতিদিন বিকেল চারটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে পড়াশোনা চলে। ছয়টি সারিতে ত্রিপল বিছানো। সেখানে প্রতিটি শ্রেণি আলাদা বসে। তবে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত একসঙ্গে বসে। মাজেদা আক্তার ধানমন্ডি উচ্চবিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ছে। সে বলে, 'ক্লাস টু পর্যন্ত নিজে নিজে পড়তাম। বাসায় টিচার নেই। আর আম্মুর সামর্থ্য নেই প্রাইভেট পড়ানোর। পাশের বাসার একজন এখানে পড়ত, তার সাথেই ক্লাস থ্রি থেকে এখানে পড়ি।' মাজেদা প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পায়। মো. শাহাদাত নামে একজনকে পাওয়া গেল, যে সকালে কাজ করে, বিকেলে পড়ে। শাহাদাত এখানে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জুলকারনাইন তিন বছর ধরে হাসিমুখ স্কুলের শিক্ষক। বিকেল হলেই তিনি এখানে চলে আসেন। তিনি বলেন, 'ওদেরকে আমরা স্কুলের সিলেবাসই পড়াই নিজেদের মতো রুটিন করে। প্রায় ৩৫ জন ভলান্টিয়ার টিচার আছেন। পালা করে তাঁরা পড়ান।' তিনি আরও বলেন, এখানে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীও পড়ে।

হাসিমুখ স্কুলে বর্তমানে ১৩০ জন শিক্ষার্থী আছে। সবচেয়ে বেশি শিশু শ্রেণিতে। সেখানে পড়ছে ৪৫ জন। গড়ে ১০০ শিক্ষার্থী প্রতিদিন উপস্থিত থাকে। স্কুলের খরচ সম্পর্কে জানতে চাইলে জুলকারনাইন বলেন, বিভিন্নজনের সাহায্য-সহযোগিতায় স্কুলটি চলছে। স্কুলের একটি কমিটিও আছে।

এ স্কুলের আসবাব বলতে ত্রিপল। ক্লাস শুরুর আগে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই ত্রিপল বিছিয়ে নেয়। সারি বেঁধে যে যার ক্লাস অনুযায়ী বসে পড়ে। প্রতিদিনই রুটি বা বিস্কুট দেওয়া হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন উৎসবে খাওয়া ও নতুন পোশাক পায় ওরা।

মিনারা আক্তার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে পড়েন। বিকেল হলেই চলে আসেন হাসিমুখ স্কুলে। পড়াতে কেমন লাগে জানতে চাইলে বলেন, 'আজকে আমার পরীক্ষা ছিল, কিন্তু মাথার মধ্যে ঘুরতে ছিল, কখন আসবে ওদের কাছে।'

হাসিমুখ স্কুলটি সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের অধীনে 'হাসিমুখ সমাজকল্যাণ সংস্থা' হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের কাজ চলছে। হাসিমুখের শুরুর দিকের শিক্ষক জোবাইদা বলেন, হাসিমুখকে তাঁরা আরও বিস্তৃত করতে চান। শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেদের ইচ্ছেমতো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

গাছের নিচে পড়ুয়া সেই উর্মির কাছে প্রশ্ন—স্কুল কেন ভালো লাগে? উর্মির উত্তর, 'মিনারা মিস অনেক আদর করে।'